স্পর্শ

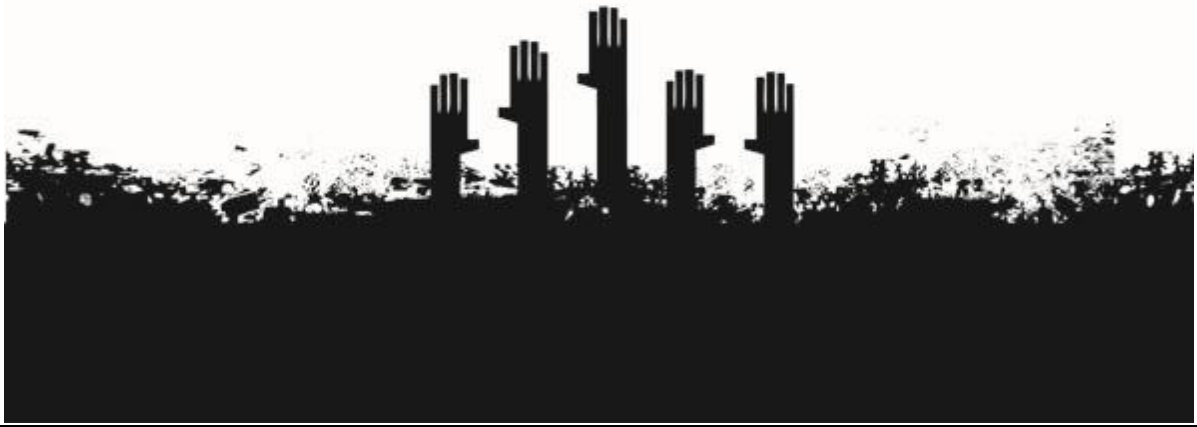

Sparshow (means Touch)

A Quarterly Magazine

Parental Care India

March 2015

About us: Parental Care India

We are a company dedicated to look after the overall well being of your parents. Our mission is to bridge the distance between you and your parents with strong communication and personalized care.

Being an NRI myself, I know firsthand how it feels to have my parents go through the difficulties of dealing with the urban jungle that Indian metro cities have become. I see the fear in their eyes every time I meet them personally. They have lived all their lives working hard and providing the very best to us the children. It's painful to see that they are imprisoned in their own houses because there is no reliable service provider who can take care of the logistical details .

So, our company will do exactly that. Be the helping hand . not for a day or a month, but throughout the year. Our services are listed in the "Home-based Care Services" section of this website. Please take a look and looking forward to seeing you as a member. Our goals:

- Our job is to take care of your parents' needs.
- Keep you updated about what's going on in their lives.
- Help you be an active participant in their lives.
- Our mission is to be there when you or your parents need us.

Animesh Chowdhury
Founder

Kolkata Office:
Santi Apartment (2nd Floor)
G-1 , Rabindrapally , Joramandir
Kolkata, WEST BENGAL 700059
India

nripc.india@gmail.com
http://www.nriparentalcare.com/

Kolkata (Mobile) : 9333 733 760
US: 1-240-620-2026

Table of Contents

About us: Parental Care India 2

মুখবন্ধ 4

নাড়ীর টান 5

স্বপ্ন 10

বৈচিত্র্য-র ঐক্যতা 11

অনন্ত জীবন 12

জীবন-যাপন 13

কথার কথা 14

এক সুরে বাঁধি 15

সারকথা 16

A Trip Away From London 17

The Lone Soldier and the Battlefield 20

Hands That Care 21

Enigma 22

মুখবন্ধ

দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ । পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মানুষের নিত্য আনাগোনা । জীবন ও জীবিকার তাগিদে ছন্ন–ছাড়া প্রতিদিনকার বেঁচে থাকা, যূথবদ্ধ সমাজ ও সংসার এখন এক ব্যতিক্রমী ধারনা। এক জায়গায় থেকে কাছের মানুষ-জনকে নিয়ে চলবার অভিপ্রায়ের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিজস্ব স্বপ্নপূরনের আশা । মানুষের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তার সাথে বেড়েছে একাকীত্বের যন্ত্রণাও। প্রিয়জন,পরিজনদের ছেড়ে আধুনিক প্রজন্মকে বাসা বাঁধতে হচ্ছে অপরিচিত সীমানায় । ফলে বয়স্ক বাবা-মায়েরা প্রয়োজনের সময় ছেলে-মেয়েদের কাছে পাচ্ছেন না । অপরদিকে ভিন-দেশে থাকা ছেলে-মেয়েরাও তাদের কর্তব্যের পরিমাপ করতে বাধ্য হচ্ছেন পাথিব উপকরনের মাপকাঠিতে । এমনই এক বিপন্ন সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে এবং পারস্পরিক দূরত্ব ঘোচাবার জন্য আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু । দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখলাম অনেক কিছুই । দেখলাম প্রচুর কৃতিত্বের অধিকারী মানুষ বয়সের ভারে ন্যুব্জ, দেখলাম মারণ রোগে আক্রান্ত অনেক সাহসী মানুষও হারিয়ে ফেলেছেন আত্মবিশ্বাস, আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও নির্বান্ধব জীবন-যাপন মানুষের জীবনে ডেকে আনছে একাকীত্বের অভিশাপ । এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সাধ্যমতো দূর করে কোলকাতায় বসবাস করা বয়স্ক বাবা-মায়েদের শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রনার উপসম ঘটানো আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ।

শুরুতে যে প্রক্রিয়াটা ছিলো শুধুমাএ একটা প্রচেষ্টা, আজ তা হয়ে উঠেছে সার্থক রূপায়ন । এতদিনে আমরা অনেক মানুষজনের সংস্পশে আসতে পেরেছি এবং সবচেয়ে বড় কথা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধ্যমতো সহায়তা প্রদান করতে পেরেছি -- এটাই আমাদের সবথেকে বড় সাফল্য । আর এই সাফল্যের অংশীদার আমার সহকর্মীরা, যাদের ঐকান্তিক সহযোগীতা আমাদের প্রতিদিনকার কাজে প্রধান সহায়ক ।

তৃতীয়বার "স্পর্শ" প্রকাশ করতে পেরে আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকাটি হয়ে উঠেছে আমাদের অস্তিত্বের স্মারকচিহ্ন । এর প্রতিটি পাতায় ধরা থাকুক আপনাদের সকলকার জন্য উষ্ণ অভ্যথনা । আগামীদিনে পথ চলার পাথেয় হয়ে উঠুক এই ভালোবাসার "স্পর্শ" ।

পেরেন্টাল কেয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষে
দেবব্রত ব্যানাজ্জী

নাড়ীর টান

প্রানজিৎ সাহা

“আঃ, উহু, আহা, আ-হা-হা, কি আরাম, কি শান্তি, আরো দিন্” – বন্ধু অর্ণব আর আমি ল্যাঙোট বাবাজী হয়ে পদ্মাসনে বসে আছি লেক কুয়ামাকার পাশে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর গোড়ালি ডোবা জলে আর সিধুদা একটা বাটি করে উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামা হিমশীতল জল আমাদের গায়ে ঢালছেন । দুপুরের প্রচন্ড গরমে অস্থির হয়ে আমি লেকের জলে মনে মনে ক’বারই ঝাঁপিয়ে পড়েছি ইতিমধ্যে । কি করব, কোথায় যাবো ভাবছিলাম আর তিনজনে মিলে ক্যাম্প সাইটের দিকে হাঁটছিলাম । রাম দোকানে গিয়েছে, কি যেন আমাদের সাময়িক ভাঁড়ারে নেই, তা আনার জন্য । হঠাৎ করেই ঝিরঝিরিয়ে বয়ে যাওয়া নালাটার দিকে চোখ পড়লো সিধু’দার আর লোভের বোমাটা উনিই ছুঁড়লেন – “গিয়েছিলাম একবার অরুনদার সাথে Azusa দিয়ে পাহাড়ের ওপরে । কি ভালো নদী, কি তার জল, সবাই মিলে চান করেছিলাম, শরীর-মন দুই-ই প্রফুল্ল হয়ে গিয়েছিলো, খেতে বসে দেখি রান্না করা খাসীর মাংসে সর পড়ে রয়েছে, কি তার সোয়াদ্, এক টুকরোও পড়ে থাকেনি”, ইত্যাদি, ইত্যাদি । এমনিতেই আমরা নাচুনে বুড়ীর সাক্ষাৎ স্যাঙাত, উনি মন বুঝে ঢোলে কাঠি খানা সপাটে কষিয়েছেন – আর যায় কোথায় ! শুধু রেঞ্জারের ভয়ই নয়, নিতান্ত লোকালয় বলেও নাঙ্গা বাবা হওয়া গেল না । দ্রুতবেগে গেন্জি-প্যান্ট ছুঁড়ে ফেলে ঘটি না ডোবা তালপুকুরে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে গা ভেজানোর প্রয়াস দেখলে গ্রামের শিশুরাও হাসতে হাসতে বিষম খেয়ে যেত । সিধু’দা কোত্থেকে একটা বাটি মত জোগাড় করে এনে পালা করে দুজনের গায়ে জল দিতেই আমরা সমস্বরে আনন্দধ্বনি দিতে শুরু করেছি ।

একগাদা তৃতীয় শ্রেনীর ছেলেমেয়ে, ক’জন শিক্ষক, ক’জন অতি উৎসাহী বাবা-মা কে নিয়ে স্কুল-বাসটা যখন কল্ কল্ বেগে বয়ে যাওয়া জলধারার পাশ দিয়ে ধীরগতিতে এঁকেবেঁকে San Gabriel পাহাড়ের গর্ভে ঢুকে যাচ্ছিল হঠাৎ আমার মনে হলো এই নদী আমার কত চেনা । কোথায় যেন একে দেখেছি, এর পাশ দিয়ে হেঁটেছি, এর জলে অবগাহন করেছি, এর পাড়ে বসে সর পড়া খাসীর মাংস – ও, ও, এই সেই নদী যার রুপের বর্ননা শুনেছি অন্তত দশ বার ।

ইউরেকা মূহুর্ত তাহলে সবার জীবনেই আসে !! মেয়েটা পিছনের সীটে বন্ধুদের সাথে টেইমার সুইফটের ইদানীং কালের জনপ্রিয় গানটা হেড়ে গলায় গাইছে হাত-পা ছুঁড়ে, কি অনাবিল আনন্দ ওদের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীতে । চিৎকার করে ওকে বলতে চাইলাম, “জানিস বাবা, এই সেই নদী যার গল্প.....”। পাশে বসা সুন্দরীর দিকে চোখ পড়তেই নিজের আবেগকে সংযত করে ফেললাম । বাপরে, কি কপাল করে তাঁর পাশে বসেছি । পঁচিশ মিনিট ধরে বাস চলছে, কোনও কথা নয় পাশের সীটে বসা সহযাত্রীর সঙ্গে, এমন বিরক্তিকর ভ্রমনও আমার ভাগ্যে লেখা ছিল । কথা তো নয়ই, নট্ নড়নচড়ন – নট্ কিচ্ছু, তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে, আমি অন্য পাশের

জানালা দিয়ে পাহাড়ের নৈসর্গিক শোভায় মন ধুয়ে নিচ্ছিলাম । একটু পরেই বাসটা একটা রেঞ্জারের অফিসের সামনে এসে থামলো আর লাইন দিয়ে আমরা সবাই এক এক করে নীচে নেমে এলাম ।

আমার মেয়ে, জয়িতা, কদিন ধরেই ঘ্যান ঘ্যান করছিল, "বাবা, চলনা আমাদের সাথে, সবার বাবা-মা যায়, তোমরাই শুধু যাওনা" । গুলে খেয়ে বসে আছে যে দু বৎসর আগেও ওর সাথে Bob hope Airport-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম ওর স্কুল থেকে, কি করে যে স্কুলের পড়া মনে রাখে কে জানে । শুধু কি অনুরোধ, রাগ করাও হয়ে গেছে কয়েক প্রস্থ, "Silent treatment" দেওয়া হয়েছে বাপকে তিনবার, চোখ-মুখ কুঁচকে ঠোঁট ফুলিয়ে কান্নাও হয়েছে বার দুয়েক । আরে বাবা, এ কি রামের (বন্ধু রামসেন নয়, সীতার রাম) বনবাস যাওয়া যে দাবী ওঠার সাথে সাথেই দলবল নিয়ে সস্ত্রীক–সভ্রাত দন্ডকারন্য চলে গেলেন পিতৃসত্য রক্ষা করার জন্য । TB shot নিতে হবে, report এনে স্কুল অফিসে জমা দিতে হবে, নিজের অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে, এতগুলো বাচ্চার সাথে যাব ওদের জন্য কিছু একটা কিনতে হবে, তার উপরে নিজের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । তোরাতো বাপু ঠান্ডা মাংসের স্যান্ডউইচ খেয়েই চুয়া ওঠা ঢেকুর তুলিস, ও মাল যে লাঠি দিয়ে গুঁতোলেও বাঙালের গলা দিয়ে নামে না । কি খাব, কিভাবে নেব এসব ভাবতে ভাবতে ব্যাপারটা প্রায় গুরুচন্ডালী হয়ে যাচ্ছিল।

গৃহিনী নির্বিকল্প চিত্তে বললেন, "পান্তা বানিয়ে দেব, নিয়ে যেও"। অনেকটা ঘাম দিয়ে ম্যালেরিয়া ছেড়ে যাবার মত বোধ হলো । প্রধান চিন্তা যখন মাথা থেকে নেমে গেল বাকি সব কাজ কিরকম সহজ হয়ে গিয়েছিল । ক্রমেই যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো আর মনটাও আস্তে আস্তে খুশীতে ভরে উঠতে লাগলো ।

২০১০ সাল, মার্চ মাসের ১২ তারিখ, সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তৈরী হয়ে জয়িতা কে নিয়ে ওর স্কুলে গিয়ে হাজির হলাম । নিয়মিত শিক্ষক স্যাম চুয়্যাং এর অবর্তমানে মিস্ এম (পুরো নামটা মনে নেই, জিজ্ঞেস করেছিলাম) আরও একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, চারজন বাবা-মা (আমার সাথে একই সীটে বসা সুন্দরীও মাইকেল নামের একটি দেবশিশুর মা) এবং সব

ছাত্রছাত্রীরা সাড়ে আটটায় লাইনে দাঁড়িয়ে বাসে উঠে গেল বাস ড্রাইভার স্কুল বাসে চড়ার নিয়ম কানুন সবাইকে আর একবার মনে করিয়ে দিলেন। ওহ্ বলতে ভুলে গেছি, আমার ইতিমধ্যেই জয়িতা ও তার তিন বন্ধুর দায়িত্ব প্রাপ্তি হয়েছে। বাস ছাড়তেই কার দায়িত্ব কে নেয়, কার গোয়াল কে দেয় ধুয়ে। আমরা বড়রা বাসের সামনের দিকে আর ওরা পিছনের দিকে বসে চলেছি, আমরা আপ্রান চেষ্টায় চুপচাপ থেকে ভদ্রলোক সাজার চেষ্টায় আর ওরা নেচেকুঁদে মহানন্দে নাচতে নাচতে ও হাসতে হাসতে Huntington Drive-এ বাস মোড় ঘুরলো, রামের (সীতার রাম নয়) বাড়ির সামনে Outback House এর পাশ দিয়ে নির্বানা, AAA-র Office, এসব পেরিয়ে 210 East এ গিয়ে বাস উঠলো। বাঁদিকে পাহাড়, ডানদিকে দোকানপাট, বাস শাম্বুক গতিতে এগিয়ে যাছে আর রাস্তার সব পূর্বমুখী গাড়ি জেন আমাদের পেছনে ফেলে কে আগে যেতে পারবে তার প্রতিযোগীতায় মেতে উঠেছে। ভাগ্যিস

খুব বেশীক্ষণ থাকতে হয় নি 210-এর উপর, কুড়ি মিনিট পর বাস Azusa Ave তে exit এ বেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের গর্ভমুখে যেতেই হাতের ডান দিকে সেই বিখ্যাত জলধারার সাথে হাজার চোখের মিলন হল। "তারে আমি চোখে দেখিনি, তার অনেক গল্প শুনেছি, গল্প শুনে তারে আমি অল্প অল্প ভালবেসেছি" – কবে শেষবার এ গান শুনেছি, এর পরের লাইনটা কি, জোর চেষ্টায়ও কিছু মনে পড়ল না। গরবিনী স্রোতস্বিনীর জন্য যদি যদি পরের লাইনটা লেখার সুযোগ আমি পেতাম, তবে হয়তো এভাবে লিখতাম – "প্রথম দেখার পরে বুকে আমি ডুবে মরেছি"।

বাস থেকে নামতেই একদল Ranger এসে বাচ্ছাদের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে আমাদের রেহাই দিল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার নিশ্চিন্তে নিজের মত করে পাহাড়টা উপভোগ করতে পারবো ভেবেছিলাম। পাহাড়েরও যে নিঠুর হৃদয় আছে এবং কেউ কিছু ভাবলেই তার ঠিক উল্টোটা ঘটিয়ে দেবে তা আগে থেকে কি করে জানব? Ranger-রা বাচ্ছাদের পাহাড়ের কানুন বুঝিয়ে বললো – কোনটা ভাল গাছ, কোনটা বিষ গাছ, এত কে জানতো! একজন Ranger তো রীতিমতো কমেডিয়ান, কোনও বাচ্চা বেচাল করলেই চোখ গোল্লা গোল্লা করে বলছে, "Your eye balls to my eye balls!!, আর আমি প্রতিবার ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে হেসেছি।

পাথর দিয়ে ছেঁচে Yucca গাছের কচি ডাল কি সুন্দর তুলি হয়ে বাচ্ছাদের হাত দিয়ে গুহাচিত্র আঁকার কাজে ব্যবহৃত হতে লাগলো। আমার হঠাৎ মনে উঁকি দিয়ে গেল, আরে! আমরাইতো ছোটবেলায় নিমগাছের ডালকে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে একটু নরম করে দাঁত পরিস্কার করার কাজে ব্যবহার করতাম। খুব ছোটবেলায় মা আঙ্গুল দিয়ে ঘষে দাঁত পরিস্কার করে দিতেন, মাঝেমধ্যে একটু ছাই বা একটুকরো কয়লা হয়ত ব্যবহার করতেন। একটু বড় হয়ে আমরা বোতলে করে বাড়িতে আসা হাল্কা সবুজ রঙের একধরনের গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজতাম, কোথাও গেলে নিমের ডালই ভরসা ছিল। ব্রাশ পেইন্ট আনেক পরে আমরা পেয়েছিলাম, তাও পেস্ট শেষ হয়ে গেলে কবে বাবা শহর থেকে বাড়ি আসবেন তখন অব্দি পুরান ব্যবস্থাতেই ফিরে যেতে হল। বাচ্চারা ছবি আঁকছে আর আমি ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছি। এক কোনে কাঁচের বাক্সে দুটো বিধঘুটে সাপ রাখা আছে। আর এক কোনে একটা বড় ফ্রেমে নানা রকমের কয়েকশো প্রজাপতি মমি হয়ে ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে, কি তাদের রঙের বাহার, কি তার শোভা! অন্য কোনে, কি ওটা হ্যারিকেন মত দেখতে, তিনটে রাখা আছে দেখছি পাশাপাশী। এরকম দুটো হ্যারিকেন আমাদেরও ছিল। মা প্রতিদিন বিকেল হওয়ার আগেই চিমনি মুছে, কেরসিন তেল ঢুকিয়ে দুটো হ্যারিকেন আর একটা বাতি প্রস্তুত করে রাখতেন। সন্ধের পর মা বাতিটি নিয়ে রান্নাঘরে চলে যেতেন, একটি হ্যারিকেন নিয়ে সব ভাইবোনেরা পড়তে বসতাম, বাকি হ্যারিকেনটা ঘরের অন্য সারা কাজে লাগতো। প্রায় প্রতিদিন আমাদের ঝগরা হত কার দিকে কম আর কার দিকে বেশি আলো পড়ছে এ নিয়ে আর মা এসে হাতে যা থাকতো তাই দিয়ে কয় ঘা বসিয়ে আপাতঃ শান্তি স্থাপন করে যেতেন।

ছবি আঁকা শেষ হবার পরপরই ত্রিশ মিনিট সবাই মিলে পাকদণ্ডী বেয়ে হেঁটে আসার পর বাচ্ছারা সবাই পাইন গাছের ঝরে পরা ছোট ছোট ডগা কুড়তে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কি যেন বানানো হবে। Ranger এসে শিখিয়ে দিল কি করে প্রথমে রাবারব্যান্ড মুড়িয়ে তার পর সরু দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়ির দু'মাথায় দুটি পুঁতি বেঁধে দিতেই তৈরি হয়ে যায় ঝাড়ু । এরা নাকি পুরানো দিনে এই ধরনের ঝাড়ুকে চিরুনি হিসাবেও ব্যবহার করতো । আমার মা/ঠাকুমাও ঝাড়ু বানাতো, নারকেল গাছের বুড়িয়ে যাওয়া ডাল থেকে এক এক করে শলা তুলে নিয়ে সব শলাগুলি তার দিয়ে বাঁধতে হত। একটু ঢিলে হলেই শলা কদিন পর ঝরে পড়তে শুরু করবে, আবার বানাতে হবে তখন, তার সাথে শাশুড়ির বেজার মুখ তো রয়েছেই।

ঝাড়ু পর্ব শেষ হতেই মধ্যাহ্নভোজের জন্য বিরতি। চারটে বাচ্চা আর আমি এক সাথে বসে গেলাম। এর পর একটা কেক তাড়াহুড়ো করে গলাধকরন করেই ওরা অন্য সব বাচ্চাদের সাথে খেলতে চলে গেল। মা-বাবা ও শিক্ষিকারা সবাই একটা গাছের ছায়ায় ঝরে পড়া পাতার জাজিমের ওপর আরাম করে গা এলিয়ে বসলাম। সুন্দরী হঠাৎ করেই সুরের ঝঙ্কার তুললেন, "তুমি বাসে আমার সাথে কথা বলনি কেন ?" ঝটিতি উত্তর বেরিয়ে গেল, "তুমিও তো বলনি"। নিচু গলায় বললেন, "আমি খুব একটা কথা বলিনা"। আমি খুব কথা বলি, কারনে বলি, বেশির ভাগ অকারনেই বলি, বন্ধুরা বাচাল বলেই জানে –ভদ্রতার মুখস সরিয়ে বলা গেলনা এসব। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার ছেলের কি হয়েছে, তুমি কি যেন পরীক্ষা করছিলে?" ব্যাস, আর যায় কোথায়, বন্ধুত্তের সামান্য বুদবুদের দেখা আমরা অপরিচিতের গণ্ডি পেরিয়ে বাকবাকুম স্বরে কলরবে মত্ত হয়ে গেলাম। আমার বাড়ির খবর আর ওর হাঁড়ির খবর মিলেমিশে পৃথিবীর আর সব প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় আওয়াজের মত ইথারে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করলো। কিছুক্ষন পর উনি অন্যদের সাথে গল্পে মেতে উঠলেন আর আমিও সোয়েটারটা মুড়িয়ে মাথার নিচে দিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ যেন চমকে উঠলাম, একি অপূর্ব দুপুর, আকাশ থেকে তাল তাল সোনা ঝরে সমস্ত পাহাড়টাকে ধুইয়ে দিচ্ছে, চারিদিকে নাম না জানা পাখিদের কলতান, একটু দূরে বাচ্চারা মনের আনেন্দে হল্লা করছে। আমি খোয়ারি দেখতে লাগলাম। বিশাল এক মাহফিল যেন জমছে আমার চারপাশে, সোনা ঝরা রোদ-পাখির ঐক্যতান – বাচ্চাদের হুল্লোড় – ধীর গতির জীবন কেমন যেন আমার চোখে দেয়ালা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেকদিন আগের আমার শৈশবের এক পড়ন্ত বিকেলে নিয়ে আমায় আছড়ে ফেলল।

ভরা গরমের বিকেল, আমি মন্দিরের বারান্দায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছি খেলতে খেলতে হাঁফিয়ে যাওয়ার পর। ক্লান্ত চোখে দেখতে পাচ্ছি বাড়ির সামনে পুকুরের পাড় দিয়ে জেলে পাড়ার নারায়ণ কাকা মাছের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে কালীর বাজারের দিকে যাচ্ছেন। শীতলা বাড়ির পিছনে পথ দিয়ে কানি বুড়ি (ওর অন্য কোন নাম তখনও জানতাম না) এক হাতে একটা বড় বাটির ওপর একটা কলাই করা থালা ঢাকা দিয়ে দিনের পরিশ্রমের দাণ বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, বিধবা মেয়ের ঘরের নাতিটার সাথে ভাগ করে খাবে। বাড়ির দক্ষিন হিস্যার ঘর থেকে জেঠিমা গলা চড়িয়েছেন, "ও স্মৃতিলো, তোরে কইছি গরুগানি দজ্জাত বাণধি আয় আর তুই হেতেরে মাইরা (ডাঁটা) ক্ষেতে ছাড়ি দি চলি গেছত, আইজ্জা তোর হিড়ের চামড়া তুলি হালুম"। বেচারি স্মৃতি, খুব মার খাবে আজ ওর মায়ের হাতে,

কোথায় গিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলছে কে জানে? আমার ঠাকুরমা দিবা নিদ্রা শেষে উঠে এসে রান্নাঘরের চুলোর পেট থেকে গরম জলের ঘটিটা এনে পিছনের চাতালে বসে হাত-পা ধোয়ায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন। মা বাড়ির উঠোন ঝাড়ু দিয়ে এসে বাণদুয়ার (backyard) ঝাড়ু দিচ্ছেন। ঠাকুমা হঠাৎ বললেন, "এগো নতুন বউ, দিলা (দিল মোহাম্মাদ) নারকেলের ডগা কাটিদি গেছে, হলা তুমি লইছ, হিছছা বানানা লাইগবো। কাইল্যা হোলাহাইনে হাইরকেনের বুক জ্বালাই হালাইছে, নোয়া একখান হইলতা (সলতে) লাগাই দিছ আইজ্যা তেল ভইরতি গেলে," একপর চোখ পড়লো আমার ওপর, "ও নিতিশ, উডি যা, কালীর বাজারে যাওন লাইগবো, এক বিড়া হান আর দুই গণ্ডা বাংলা কলা আনিছ। এই মাসের বিপদনাশিনীর সেবা, হরির লুঠ বেক বাদ রইছে। ধোয়া বাড়ির কাছে দি যাইবার সময় মরইন্যার মারে ডাকি দি যাইছ। ধান ভিজাইছি কাইল্যা খই ভাজন লাইগবো"। হায়রে কোথায় গেলো সেই মায়াজাল বিছানো বাড়ি-ঘর – মানুষ – পুকুর – মান্দির – গ্রাম – আমার শৈশব। সেই দরদিয়া সময় কেমন করে কোথা দিয়ে পেরিয়ে আমি এই মধ্য বয়সে এসে পৌঁছালাম। একটু সুজন হলেই যখন তেঁতুল পাতায় তিন নয়ে সাতাশ জন ধরত সেই সময়টা বুঝতে না বুঝতেই পেরিয়ে এসে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে স্বজনহীন জীবন বয়ে চলেছি । কোথায় গেল আমার ঠাকুরমা, একটিবার যদি বিলম্বিত লয়ে "নি-তি-ই-শ-শ" বলে ডেকে আমার কান সুধায় ভরিয়ে দিতেন ? আর একবার যদি দেখতে পেতাম, শেষবারের মতো প্রনাম করতাম, কোলে নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত বালা – মুসিবত থেকে দূরে রাখার জন্য আমার দুহাতের সব নখ দাঁতে কেটে দিতেন।

চোখের জল গড়িয়ে হাতের ওপর পড়তেই ঘোর কেটে গেল। সোয়েটারের হাতায় চোখ মুছে উঠে বসতেই ফেরার ডাক শুনতে পেলাম। খেলায় মত্ত মেয়েটাকে ডেকে কিছুক্ষনের জন্য জড়িয়ে ধরে আদর করে দিলাম। ওর আবদারেই এখানে আসা, ওদের আনন্দ দেখতে দেখতে নিজের শৈশবে ফিরে যাওয়া, স্মৃতির অতলে ডুবে হীরে – মনি-মুক্তা খুঁজে পেয়ে ক্ষণিকের জন্য আনন্দের ভেলায় ভেসে বেড়ানো। হরিবোল, হরিবোল ।

স্বপ্ন

সুশান্ত ঘোষ

স্বপ্নটাকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যাওয়ার পুঁথির খাতে
স্মৃতির মাঝে জীবনটাকে খুঁজে পাওয়ার আঙিনাতে।
রঙিন আলোর ঝর্ণা বেয়ে অতীত দিনের স্বপ্ন জ্বেলে
ভালবাসার স্পর্শে জাগায় প্রলম্বিত ছায়া ফেলে।
চাওয়া – পাওয়ার বেদনা ভুলে এগিয়ে যাওয়ার ঘূর্ণিপাকে
ব্যর্থ প্রেমের জটিলতায় জীবন চলে দুর্বিপাকে।
যন্ত্রনাকে পাথেয় করে মন কেঁদে ওঠে তৃষ্ণার জেরে
গানের সুরে বেজে ওঠে স্বপ্নকলির স্মৃতির ঘিরে ।
লিখতে গিয়ে কলমখানি কেঁপে ওঠার ধ্বনি বাজে
মনটা যেন উদাস হয়ে উড়তে জাগে পাখির মাঝে ।
স্মৃতির মাঝে জেগে ওঠে স্বপ্নকলির গাঁথা তুলি
হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাগুলি না – পাওয়া বেদনার বুলি ।
স্বপ্ন দেখার আসরেতে সত্য – মিথ্যা হিসেব করে
উদ্ধৃত্তের খতিয়ান মেলানোর সাধ্য কূলায় কার ?

বৈচিএ্য-র ঐক্যতা

রণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাহাড়, নদী, সাগর, আকাশ আছে
গাছ গাছালি, পাখ – পাখালীর কাছে
জঙ্গল জঙ্গল ।
বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ হাতির দল সেথায়
দলে দলে দল বেঁধেঁ সব বাঁচে ।

একে একে একটা শতক হয়
সমষ্টিতে অনন্ত বিস্ময় !
সসীম কখন অসীম হল মহাশূন্যময় !
দৃঢ় তবু অধিষ্ঠানে যে যার নিজের কাছে।

জীব জীবনের প্রানের ধারা প্রানে প্রানে বয় -
আছি আছি রব উঠেছে সারা আকাশময় !
তুমিও আছো, আমিও আছি, জীবজগতে সবাই বাঁচি ।
জীবের সেরা আমরা মানুষ এইতো পরিচয়।

মরতে যখন হবেই তখন সগৌরবে মরো
সভ্যতাকে দাও কিছু দাও একটা কিছু করো
দলবাজি নয় একতাতেই সবার ভালো চেয়ে
সবাই মিলে কাজ করে যাও আনন্দ গান গেয়ে
সবার ভালোয় তোমার ভালো
পরানটা তো প্রানপনে ভাই পরান কে যে যাচে,
সবার তরে মিলে মিশে তাই তো সবাই বাঁচে ।

ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে কিছু তুমি করো
শান্তি সুধায় তৃপ্তি সুখে মাধুর্যে প্রান ভরো
জীবন জয়ের গানে গানে জীবন মুখর করো
বৈচিএ্যের ঐক্যতানে সৃষ্টি ধারায় স্বভাব হয়ে
প্রকৃতি মা বাঁচে,
ভারসাম্যের স্বমহিমায় প্রকৃতি মা বাঁচে ।।

অনন্ত জীবন

দীপালি পাকড়াশী

কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় ঘেরা বারান্দা
কোনে বসে ভাবনার সুতো বুনে চলেছি
সামনে রাস্তায় ছুটে চলেছে
ছুটন্ত দুরন্ত অনন্ত গাড়ীর অবিরাম চলা
তারা যেন আবাহমান কাল ধরে
ছুটে চলেছে ।
সেটাই তো সত্য । জীবন কি থেমে থাকে ?
মৃত্যু ? সে তো কেবল একটা ছেদ
কোথাও সেমিকোলন, কোথাও দাড়ি
নিখিল ভুবনের পারে, অসীমে তোমার বিচরণ
অস্তগামী সূর্য্ ডুব দেয় দিগন্তে
নিয়ে আসে নতুন প্রভাত নতুন আলো
জীবনতৃষা মেটে না কভু
বাড়ায় শুধু হলাহল – নিকষ কালো
তবু ভুলে যাই, ভুলে থাকতে চাই
মত্ত হস্তীর ন্যায় বৃথাই স্নান
ধুলো কাদা মেখে আবার খেলায় মেতে থাকি
জীবন সায়াহ্নে হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখি
জমার ঘরে বিরাট এক শূন্য
আছে যা খুবই নগন্য
অহংকারী বেহিসাবি পথু করেছে আমায় দৈন্য ।

জীবন-যাপন

সুনন্দা ব্যানার্জ্জী

খামখেয়ালী জীবন-যাপন
ভাল্লাগেনা যখন তখন,
এমনি করে যায় যদি দিন যাক্ না ।

বললে তুমি মুচকি হেসে
ঢের হয়েছে ভালোবেসে,
অগোছালো জীবন-যাপন আর না ।

গুছিয়ে বসো সংসারেতে
জীবন ছিলো হাড়-হাভাতে,
এবার হবে স্বপ্ন রঙীন ভরা ।

বসবো দুজন মুখোমুখি
আপন মনে সদাই সুখী,
সারাদিনের কাজ হলে পর সারা ।

গল্প হবে আলটপকা
না ঘরকা না ঘাটকা,
আজগুবি সব ভালোলাগার কথা ।

চুপিসাড়ে রাত্রি নামে
তাকিয়ে থাকি সমুখ পানে,
সকাল হলেই ভুলবো সকল ব্যথা ।

কথার কথা

সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়

কতো কথা বুকের মাঝে

তাই দিয়ে যায় মুক্ত গাঁথা,

কথা কত গল্প বলে-

সুখ দুঃখের নকশিকাঁথা|

কথা চোখে স্বপ্ন আঁকে

বুকের ভেতর কাঁপন তুলে-

কথা তুমি যুদ্ধ তোল

চায়ের কাপে ,মাঠে;মিছিলে ,

বাইরে কথা থেমে গেলে

মনের ভেতর জাগে ভয়,

নিজের সাথে কথা বলা

তখনি তো শুরু হয়।

এক সুরে বাঁধি

অনিমেষ রায়

আনন্দের হাট এ যে বুঝেছিনু যবে,
তোমারে করেছি বন্ধু নিত্য আবাহন,
হয়ত শুনেছ কিম্বা অন্যমনে ছিলে,
পারিনি খুঁজিতে পথ দু'জনায় মিলে।।

বন্ধদ্বার খুলে যবে বিস্ফারিত চোখে,
দেখেছি বিশ্বের রূপ বিচিএ বরন,
কতই বিস্ময় মনে জেগেছে তখনি,
ধ্বনিটির সাথে শুনি তার প্রতিধ্বনি।।

অসীম আকাশ ডাকে সুদূরের পানে,
বুকে ভরে সুনিঃশ্বাস মধুর বাতাস,
ঝরে পাতা বৃক্ষ ধরে সবুজ বরণ,
তটিনী শীতল ধারা বহে অনুক্ষন ।।

চঞ্চল মদির আলো স্পন্দিছে হেথায়,
তবুও কিরূপে তুমি রহিছ নীরব,
উর্দ্ধে নীল আকাশের তলে এস বসি,
একান্তে প্রকৃতি সাথে দোঁহে মিলি হাসি ।।

মনে মনে সুপ্ত ইচ্ছা সকল সময়,
এইক্ষন ব্যর্থ যেন নাহি হয় কভু,
দুটি হৃদি এক সুরে বাঁধা হোক আজি,
প্রেমের বাঁধনে দৃপ্ত ধ্বনি ওঠে বাজি ।।

সারকথা

শুক্তি বসুপাল

এটা নয় মনের মতো,
ওটাতো নয় যোগ্য -
কোনটা এবার বাতিল হবে,
কোনটা হবে ভোগ্য ?
ভেবে চিন্তে চলা কঠিন
পথটা বড়ই গোলমেলে,
জীবন মানেই অনিয়ম
তবু দিন যাবে না হেলেদুলে ।

কে ভালো আর মন্দ কেবা ?
বিচার করা দূরূহ –
নিজের ভালো নিজেই বোঝে না,
চোখে পড়ে অন্যের দোষগুলো ।
সত্য মিথ্যের দাড়িপাল্লার
ভারটা পড়ুক যেদিকেই,
তাল বেতালের মধ্যে চলা
ঠিক বেঠিকের হিসেব ভুলেই ।

বুদ্ধি নাকি গায়ের জোর,
বিদ্যা অথবা শ্রম,
কোনটা কখন জেতে হারে –
চলছে লড়াই সর্বক্ষন
কাজের আগেই লাভের আশা –
মাথার মধ্যে নড়ে চড়ে,
চেনা লোকও অচেনা হয়,
কাছের মানুষ যায় দূরে ।
শ্বাস আাছে তাই জীবন আছে,
লক্ষ্য ছাড়া জীবন বৃথা ।
পেটের তাগিদে প্রানধারন
নাকি জীবন মানে শুধু স্রোতে ভাসা ।

A Trip Away From London

Ranjan Banerjee

In August 2013 we went on a visit to London. We were only four in the party and the senior-most was on wheelchair. The tour was arranged through 'European Sojourn', a renowned Travel Agent based in US. On first two days we visited some iconic places of London like St. Paul's Cathedral, Tower of London, British Museum, London Eye etc.

Now we were eager to experience the tour away from London on third day. We finished early breakfast, the car reported in time and we started right at 8 am. Within half an hour we were out of city. Our car now followed highway No. A40 through the suburbs of London. Roadside buildings were mostly same type which is not pleasing to a commuter. Within a few minutes we were into rural England. On both sides of the highway there were screens of thick bushy trees. Wheat fields could be seen beyond the trees but harvesting was just complete. There was no industrial activity on roadside which is a major difference with the big cities of our country. UK, as we know, has big industrial cities like Glasgow, Manchester, Birmingham etc. May be this is the reason for the highway being free of local interference. We reached a Rest Area after about two hours.

Our first destination was Stratford-upon-Avon which is about 80 miles from London. After a short break we started again and reached Stratford within half an hour. Original house of William Shakespeare's father was a semi-thatched one and is still maintained by the Birth Place Trust. We were led to an adjacent bigger house known as New Place. Shakespeare made good fortune within a few years of publication of his initial plays and his books of poems. This included the famous plays like Romeo and Juliet, The Merchant of Venice, Julius Caesar, The comedy of Errors, As You Like It etc. All his Plays were highly successful in the Globe theatre of London. He was a partner of this hall also. So he purchased this big house in Stratford to live with his family. His father had glove making business and so there was sufficient land with the old house for the business purpose. A nice garden stands there at present. A half bust statue of Rabindranath adorned one corner of the garden.

Next we reached the nearby Holy Trinity Church standing with dignified facade through many centuries. Shakespeare was baptised here after birth, married here and was buried within the church hall. Graves of his wife and children are laid side by side.

From the church we went to riverside. Here was river Avon, actually a stream flowing through green fields and greener trees. Soft sunshine, cool breeze, boats on the river and holiday tourists together made a lovely setting. Shakespeare must have been in love with Avon. So he returned from London with fame and fortune, invested in house and land here, and settled down in the later part of his life (lived only 52 years). We followed the pathway along Avon chatting how

much the weather God was kind to us and what an enjoyable summer day it was. On other bank of Avon was a green valley where some people had crossed through a small bridge and were resting under the trees with their families. After about a kilometer of walk we reached a Rest Area cum Mall. There was an open stage and some people, dressed as per characters of a Shakespeare's play, were acting seriously. We went to a Restaurant in the second floor of the Rest Area and selected a riverside table. The view in front was enchanting.

After lunch we were heading towards Oxford through a rural road with two lane carriageway. Small villages could be seen now and then but there was no roadside congestion. We passed the rolling countryside called Cotswold. It was post harvesting time and lack of greenery presented a deserted look all around. Driver-cum-guide pointed to the famous Blenheim palace at a distance on our right where Winston Churchill was born. We preferred to reach Oxford early rather than spend some time for a palace visit. There was boundary wall along right side of road running for a few kilometers; this marked the Blenheim estate. Trees guarded any view of inside from the road.

Guide took us to a small town in Cotswold for a break. We came to a village café for tea. It was a very old wooden structure barely 7ft. high in the ground floor. An aged lady was manning the counter and a young man was managing tables. A few locals were enjoying scones with tea or coffee. The café sells homemade cake pieces locally called scones and other dairy products. We tasted scones with tea and left for Oxford. British people are more fond of tea than coffee.

It was Saturday and a holiday for the University. Oxford University was established in the 15th century (Cambridge also) by the Christian Missionaries. At present there are 39 colleges under the University. It seemed as a sleepy old town with very low traffic volume which of course is a blessing. Traffic is not allowed in smaller roads leading to the colleges. Our guide parked the car on a road and led us to a narrow gate beside a big gate in high wall resembling the Tower of London. This was St. Mary Magdalen College of Oxford. Inside there was a very old church and dining hall. Old ornamental building of stone stood there on the three sides of an open space, an example of a college in Oxford in the 15th century. The common rooms, an old library and numerous teaching rooms are housed in this building even now.

An insight into Magdalen gives some idea of education system followed at Oxford University. "There are six hundred students, four hundred undergraduates reading for a wide range of degrees and over two hundred graduates. There are seventy Fellows, of whom over a dozen are resident, covering a great range of subjects in the sciences and humanities. The college provides accommodation, sports and social facilities for all its members. Undergraduates are taught in tutorials, often 'one to one', which are supplemented by the University's lectures and practical classes. The college has five libraries with collections dating back to a gift of 800 manuscript books, presented by the Founder in 1481." Seven fellows of this college were awarded Nobel Prize in Physics, Chemistry, Medicine and literature.

Behind the old building was a big open space, all green and interspersed with pathways as walking on the grass is prohibited. We were now facing a big building across the lawns, built in 1733 and called the New Building since then. River Cherwell flows on the right of the lawns and on the left there is big open field known as Deer Park. A big Plane tree (like Chinar in Kashmir) is additional attraction here. It was planted in 1801 and is still pretty young by its appearance. But we could meet neither any student nor any teacher in the big campus as it was Saturday.

Guide left the car in a parking and we walked through the roads and alleys for almost a kilometer or may be more. We were always busy watching around us – buildings, road, traffic and people on the road. Alleys were not favorable for pushing the wheelchair. At last we reached the famous Christ Church College of Oxford but it was closed. Nearby there was an old building of the University which is used as Convocation Hall. Colleges look like forts as you stand in front and you will not feel like taking a snap in the camera. Why? The buildings date back to a period when missionaries were afraid of security and they had to think of first hand protection by themselves. In this connection it can be cited that king Charles I shifted his capital to Oxford during Civil War. Some of the Colleges including the Magdalen we just visited were fortified with arms, ammunition and men to fight possible attack from the Liberation Army. But nobody ever attacked the seats of knowledge like Oxford and Cambridge.

Everybody was tired by this time excepting the one on wheelchair. So we were quickly back to the car and were into the journey back to London. Oxford was around 50 miles from London and we reached hotel at 7 pm.

Our long standing desire to visit Stratford-upon-Avon and Oxford was fulfilled.

The Lone Soldier and the Battlefield

Aritro Biswas

In the desolate battlefield
The split boughs of trees bow in obeisance to the ground
While men too lay buried in their flagging strength
The only face that is unbowed,
The lone soldier looks at the sky for solace.

All hatred now unwound, friends and foes sleep together in the dust.
The lone soldier leaves them to slumber in the cradle of death.

All distinction now shed away by the Soldier and His battlefield,
Within the field all are embraced equally in the maw of death,
As foes in life become comrades in sleep,
While the soldier walks silently by their graves, impersonal in his grief.

Rising above the wreck of battle,
The soldier shovels away the tainted dirt
and buries the sleeping soldiers of the battlefield.

After the battle has left misery in its wake, a greater battle – that of sacrifice – has engulfed the field
As in denial of death's very portent,
the soldier seeks to undo the desolation of the field,
his shovel becomes his only hope of sacrifice,
as while the soldiers he buries slumber tumultuously in abandonment of the soul,
the soldier labors with only an ardor for life.
As comrade and foe destroy each other, the soldier emerges the sole victor of the battlefield and quietly proclaims his victory over death.

Hands That Care

Anuradha Dutta

Hands that care,
A thoughtful mind,
Your mission we salute,
You do remind,
God is there --
He is kind.

Away from their dear ones,
Their tearful eyes,
Wrinkled with age,
Crippled to rise.
You lend them your hand
With love and care,
It's remarkable to see
The support you ensure.

Holding their hands we had
Learned to walk;
But left them with sticks
Not a soul to talk.

You talk to them and bring
back their smile
Patiently you listen to their
Hues and cries.

You not only serve the old
You are serving the LORD,
From the bottom of my heart I pray,
Almighty would bless you all.

Enigma

Sudatta Pandey

There were nights when I thought,
"I needed You…"
And would stare blankly
Into the Sky deep blue
Cry to myself –
"O ! Where are you?"
Many a times, doubts were raised –
And I almost believed after a few days…
Perhaps You never loved me,
Perhaps You were never there for me.
It's true I've never seen Thee !
And, may be, You too, can't hear me !!
But, now I knew,
How wrong was I,
Those silly thoughts to buy !
To doubt You and Your presence –
When, to this day – You fill my life with fragrance !

For now, I feel You in every being
Yes ! I hear You when my soul sings –
I knew You bless every morning that I wake –
GOD – I feel You in every breath I take !!!